

ওপর নির্ভর না করে মানুষ তৈরি ও জাতিগঠনের জন্য সবাইকে আত্মজ্ঞান ও আত্মনির্ভরশীল হবার জন্য তিনি এই পত্রিকার মাধ্যমে অনুপ্রেরণা জোগান। এতে প্রকাশিত দ্বিতীয় প্রবন্ধে তিনি লিখেন, ‘আমাদের শক্তি বাইরের শক্তি নয়, বরং আমাদের কাপুরষতা, আমাদের দুর্বলতা, আমাদের আত্মকেন্দ্রিকতা, আমাদের হিপোক্রেসি, আমাদের অঙ্গ আবেগ।’^{১২}

বস্তুতপক্ষে, শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতি ও যোগসাধনা প্রায় একই সময়ে শুরু হয়। তিনি রাজনীতিতে সাফল্যলাভের উদ্দেশ্যে যোগসাধনা করেছিলেন।^{১৩} যোগকে তিনি শুধু ঈশ্বর উপলক্ষি বা পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক চেতনার স্ফুরণ মনে করেননি, জীবনকে আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত করার জন্য একে জীবন ও জাগতিক সকল কার্যকলাপের অনুযোগ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।^{১৪} কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে প্রথম তিনিই বলেছিলেন যে, স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জনগণের ভূমিকাই চূড়ান্ত। আবার তিনিই উপলক্ষি করেছিলেন, ‘স্বাধীনতাই শেষ কথা নয়, বরং জগৎকে একটি সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য এটি হল ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের মতো।’^{১৫} বরোদায় সমকালীন রাজনীতি ও বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকাকালে তিনি জনগণের মত পরিবর্তনের জন্য কবিতা, প্রবন্ধ, অনুবাদ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন। একটি মহৎ ও উচ্চতর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যক্তিগত মোক্ষকে প্রাথান্য দেননি। তাঁর ভাষায় ‘যে যোগ সাধনা আমরা করি, তা শুধু আমাদের জন্য নয়, বরং দিব্যশক্তির উদ্দেশ্য তা নিবেদিত। ...এটি ব্যক্তিগত মোক্ষলাভের উদ্দেশ্যে নয়, বরং মানুষের মুক্তি ও রূপান্তরের জন্য।’^{১৬}

শ্রীঅরবিন্দ লক্ষ করেছিলেন যে, ব্রিটিশ শাসন দেশে যে নতুন মূল্যবোধের সৃষ্টি করেছে তৎকালীন স্বদেশী বুদ্ধিজীবীরা শাসক শ্রেণীর সেই চিন্তা ভাবনায় প্রভাবিত। বিশুদ্ধ বৌদ্ধিক শিক্ষাটা তাঁরা পাশ্চাত্য থেকেই প্রহণ করছে দেখে তিনি বিশ্বিত হন। ফলে অপরিপক্ষ যান্ত্রিক প্রজ্ঞা দিয়েই ভারতে সব জিনিয়কে দেখা ও বিচার করা শুরু হয়। এ কারণে তিনি তৎকালীন ভারতীয় নব্য শিক্ষিতদের মধ্যে লালিত সমকালীন ইউরোপীয় ভাবধারার লালনকে সমালোচনা করে তাদের মন ও আত্মার গঠন প্রকৃতি বিকৃত বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন, ‘যদি আমরা নিজেদের ইউরোপীয় ভাবধারায় গড়ে তুলি, আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা, বৌদ্ধিক শক্তি, জাতীয় চরিত্র ও আত্মসংশোধনের ক্ষমতা হারাব।’^{১৭}

শ্রীঅরবিন্দ এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য ভবিষ্যৎ বংশধরদের পবিত্র, শক্তিমান ও জাতীয় আত্মসম্মানবোধ সহকারে গড়ে তোলার প্রয়োজনের কথা ভাবতেন। তাঁর মতে, আত্মত্যাগের গুণাবলীই মানুষকে এভাবে গড়ে তুলতে পারে। যে ব্যক্তি আত্মত্যাগ করতে জানে অন্য কোনো দোষ থাকলেও সে অতীতের পক্ষিলতাকে অতিক্রম করতে পারে এবং আরও উচ্চতর মানবতার অধিকারী হতে পারে।^{১৮} তিনি আরও মনে করতেন, যে জাতি আত্মত্যাগের মতো জাতীয় কাজ করতে জানে সে জাতি তার ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে পারে।^{১৯}

স্বামী বিবেকানন্দের ‘আমার ভারত, জাগো’ আহ্বান স্মরণ করে শ্রী অরবিন্দ ১৯০৫ সালে ভবানী মন্দির^{২০} শীর্ষক এক পুস্তিকায় ভারতকে তার অলসতা মুক্ত হয়ে

সঠিক রাস্তা খুঁজে নেয়ার আহ্বান জানান।^{২১} তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে জগতের বিবর্তনের লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য ভারতবাসী একটা ভূমিকা পালন করতে পারে, যা অন্য কোনো জাতি পারবে না। সমগ্র জগতের ধর্মের রূপরেখা দ্বারা ক্ষেত্রেও ভারত অংগী ভূমিকা পালন করতে পারে বলে তিনি মনে করতেন। বিশেষ করে সেই ধর্ম যা সমগ্র ধর্ম, বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে সমন্বয় ঘটাবে এবং মানবজাতিকে একাজ্ঞা করতে পারবে। এইভাবে শ্রী অরবিন্দ তার সময়ের দেশপ্রেমমূলক উদ্দীপনা ও বৈদানিক ভাববাদের মধ্যে সমন্বয় ঘটান।

তাঁর শিক্ষাবিষয়ক চিন্তায়ও এর প্রতিফলন দেখা যায়। তিনি আরও বৃহৎ পরিসরে শিক্ষার সমস্যা আলোচনা করেন এবং ভারতীয় জাতীয় শিক্ষা দর্শনের একটি রূপরেখা প্রণয়নের লক্ষ্যে বুদ্ধিমত্তা, আধ্যাত্মিকতা এবং অতিমানবিক নৈতিক শাস্তিকে উৎসাহিত করেন। টুকরো টুকরো শিক্ষার চেয়ে তিনি সমন্বিত শিক্ষাকে সমর্থন করেন। তাঁর মতে শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে, পৃথিবীতে এক নতুন মানব জাতির গোড়াপ্রস্তর—যাদের থাকবে এক নতুন জীবন এবং এক নতুন চেতনাবোধ। তিনি আরও বলেন, “প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটি দৈব সত্তা আছে, আছে স্বকীয়তা, নিজস্ব গান্ধীর মধ্যে যা সে পরিপূর্ণ ও বিকশিত করতে পারে। ... আমাদের কর্তব্য হল এর অনুসন্ধান করা, বিকশ সাধন করা এবং ব্যবহার করতে শেখা।”^{২২}

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিকাশমান আত্মাকে সহায়তা করা যাতে তা নিজেকে পূর্ণরূপে তৈরি করতে পারে। শিক্ষার এই পদ্ধতি হল মুক্ত বিকাশ পদ্ধতি (free progress method)। এই পদ্ধতিতে “বাবা মা বা শিক্ষকের ইচ্ছানুযায়ী শিশুকে ছাঁচে ঢালা বর্বরোচিত, অজ্ঞতাজনিত কুসংস্কার মাত্র। শিশুকে আপন প্রকৃতি অনুসারে বেড়ে উঠতে দিতে হবে।” পঞ্জিচেরী আশ্রমে Sri Aurobindo International Centre of Education এ মুক্ত বিকাশ পদ্ধতির শিক্ষায় শ্রী অরবিন্দের শিক্ষাভাবনা ত্রিয়াশীল।^{২৩}

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শ্রীঅরবিন্দ ১৯১৪ সাল থেকে সাড়ে ছয় বৎসর দর্শন, সাহিত্য, যোগ, শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা, শিল্প ও সাহিত্য সমালোচনা, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে ‘আর্য’^{২৪} পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেন। ভবিষ্যতের দর্শন হিসেবে সুধীসমাজে আদৃত The Life Divine^{২৫} গ্রন্থটি এই আর্য পত্রিকাতেই পর্যায়গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকারে The Life Divine এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ সালে এবং দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৪০ সালে। ‘আর্য’ পত্রিকা ও The Life Divine থেকের মাধ্যমেই মানব সমাজের ভবিষ্যৎ আধ্যাত্মিক বিবর্তন সম্পর্কিত শ্রী অরবিন্দের তত্ত্ব প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সময়ে The Synthesis of Yoga,^{২৬} Savitri^{২৭} ইত্যাদি গ্রন্থে এই তত্ত্বের প্রকাশ ঘটে। বস্তুত এই বিবর্তন তত্ত্ব হল অজ্ঞানতা থেকে জ্ঞানের দিকে।

শ্রীঅরবিন্দের যোগ বা তত্ত্বদর্শন ছিল ভারতের প্রাচীন ঝিলদারের থেকে কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির। তবে তাদের মতো তিনিও এই জগতের আবির্ভাবের পেছনে এমন এক পরম সত্ত্বার বা ব্রহ্মের রয়েছে বলে ভাবতেন—যিনি একাধারে সকল সত্ত্ব ও চৈতন্যের পরম রূপ। বস্তুত সকল সত্ত্ব এক অহম ও পরমাত্মায় মিলিত হয়—যদিও চৈতন্যের নানা স্তর, মন, প্রাণ ও দেহে তাদের অহম ও সত্ত্বার অজ্ঞানতাকেই প্রকাশ

করে। তিনি মনে করেন মনস্তাত্ত্বিক কিছু শিক্ষা অনুসরণের মাধ্যমে চৈতন্যের নানা স্তরের আবরণ উন্মোচন এবং আমাদের সবার মধ্যেকার প্রকৃত অহম ও দিব্যত্ব সম্পর্কে অবহিত হওয়া সম্ভব।^{১২}

শ্রীঅরবিন্দের মতে, মানুষ সাধারণত মন, দেহ ও আত্মার উপরিভাগের চেতনায় বাস করে। কিন্তু তাঁর মধ্যে অ্যুত সম্ভাবনা নিয়ে আর একটি অভ্যন্তরীণ সত্তা বিদ্যমান থাকে যার মাধ্যমে নিজেকে জাগিয়ে তোলা যায়। এর সীমিত প্রভাব মানুষকে বৃহত্তর পরিসরে নিরস্তর সৌন্দর্য, সৌহার্দ্য, শক্তি ও জ্ঞানের সম্ভান করার দিকে ধাবিত করে। অতএব, যোগদর্শনের প্রথম প্রক্রিয়া হল এই ভেতরের সত্তার অর্গল খুলে দেয়া এবং ভেতরের আলো ও শক্তির মাধ্যমে বাইরের প্রাণকে পরিচালিত করে বাহ্যিকভাবে সক্রিয় থাকা। এভাবেই কেউ নিজের মধ্যেকার প্রকৃত আত্মাকে আবিষ্কার করে। এই আত্মা, মন, প্রাণ দৈহিক উপাদানসমূহের কোনো বাহ্যিক সংমিশ্রণ নয়, বরং তার পশ্চাতের কোনো সত্তা—বলা যেতে পারে, দিব্য আঘির কোনো স্ফুলিঙ্গ। এইরূপে আত্মার মধ্যে কীভাবে টিকে থাকতে হাবে এবং সঠিক পথে পরিত্বার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে তা শিখতে হয়। অতপর আত্মা সত্তার উচ্চতর অবস্থানে আরোহণের মাধ্যমে উর্ধ্বরের অর্গল উন্মুক্তিকে অনুসরণ করে। কিন্তু তখনও তা হ্যাঁৎ পাওয়া অতিমানসের আলো এবং শক্তি নয়। কারণ সাধারণ মানব মন ও অধিমানসিক প্রকৃত চেতন্যের মাঝখানেই নানা স্তরের চেতন্য বিদ্যমান। এই স্তরসমূহের চেতন্য উন্মুক্ত করে তাদের শক্তি মন, প্রাণ ও দেহে নামিয়ে আনতে হয়। শুধুমাত্র তখনই প্রকৃতিতে বিশুদ্ধ চেতন্যের পূর্ণ ক্ষমতা সক্রিয় হয়। এই স্থীয় শিক্ষা বা সাধনার প্রক্রিয়া অতএব দীর্ঘ এবং কঠিন, কিন্তু এর ক্ষুদ্রতর অংশ অনেক বেশি পাওয়ার মতো— কারণ এর মাধ্যমে পরম মুক্তি ও পূর্ণতা লাভ অধিকতর সম্ভব।^{১৩}

এই হল শ্রীঅরবিন্দের সাধনা ও দাশনিক পদ্ধতির মর্মকথা। কোনো বিশেষ ধর্ম বা পুরাতন ধর্মসমূহের একটীকরণ বা নতুন কোনো ধর্মের বিকাশও তার উদ্দেশ্য ছিল না। এসব তাঁর মূল উদ্দেশ্য থেকে অনেক দূরে। তাঁর যোগদর্শনের সাধনার প্রধান উদ্দেশ্য হলো অন্তরের ভেতর থেকে নিজেকে বিকশিত করা। এই পদ্ধতি যিনি অনুসারণ করবেন এক সময় তিনি নিজের আত্মাকে আবিষ্কার করতেও পারবেন। সেই সঙ্গে মানসিক, আধ্যাত্মিক ও অধিমানস থেকে উর্ধ্ব চেতন্যে অতিমানস স্তরে উপনীত হতে পারবেন যা মানব প্রকৃতিকে রূপান্তরিত ও দিব্যত্ব প্রদান করতে পারে।^{১৪} ফলে রূপান্তরিত সত্তা মানুষের মানস সত্তা ভবিষ্যতের মানুষ বা অতিমানবিক মানুষের মধ্যে জায়গা করে নিতে পারবে। মানুষ পরিবর্তিত হলে তার সমাজ, প্রতিষ্ঠান, কার্যাবলী ও পরিবর্তিত হবে এবং পৃথিবীতে দিব্যজীবন প্রতিষ্ঠিত হবে।^{১৫} The Life Divine হল একজন যোগী দাশনিক হিসেবে তার অভিজ্ঞতা ও উপলক্ষের সমষ্টি। একে যোগ ও নতুন অধ্যাত্মবিষয়ক পথের ভিত্তিও বলা চলে।

ধর্ম সম্পর্কে তার চিন্তাধারাও প্রণালীনযোগ্য। তিনি একে সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতেন না। তাঁর মতে, কোন ধর্ম যদি সার্বিক না হয়, তা কখনও চিরস্তন হতে পারে না। একটি সংকীর্ণ ধর্ম, একটি গোড়ামিপূর্ণ ধর্ম একটি অনন্য ধর্ম শুধুমাত্র সংস্কৃত সময় ও সীমিত উদ্দেশ্যের জন্য বেঁচে থাকতে পারে।^{১৬} ধর্মকে অবশ্যই সর্বাধুনিক অকৃত্রিম

এবং দর্শনের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে হবে—এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। যে ধর্ম বিজ্ঞান, বিশ্বাস, আস্তিক্যবাদ, খ্রিস্টধর্ম, ইসলাম, বৌদ্ধধর্ম এবং এসবের কোনটির অন্তর্ভুক্ত না হলেও বিশ্ব আত্মার সম্প্ররংশিলাতাকে স্থীকার করে নেয় তাই ধর্ম।^{১৭} তিনি আরও বলেন, সব ধর্ম একই সত্যের নিকটবর্তী, সব দর্শন এক কেন্দ্রিক না হলেও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তা একক সত্তাকে দেখে, একইভাবে সব বিজ্ঞানও একত্রে মহাত্ম বিজ্ঞানে মিলিত হয়। একইভাবে সবধর্ম নানারূপে আমাদের মুক্তির বার্তা পৌছালেও বস্তু তা এক।^{১৮}

ধর্ম সম্পর্কিত আলোচনায় শ্রীঅরবিন্দ মার্কসেরও রেফারেন্স ব্যবহার করেন। তবে তার অবস্থান ছিল মার্কসের বিরুদ্ধে। আদি খ্রিস্টত্বের ভূমিকা আলোচনা প্রসঙ্গে মার্কস ধর্ম সম্পর্কে বলেন, নিষ্পাণ অবস্থার আত্মা হিসেবে এটি শুধুমাত্র ভারাক্রান্ত প্রাণীকুলের হস্তয়ের দীর্ঘশ্বাস। কিন্তু তিনি আরও বলেন যে, ধর্ম মানুষের জন্য আফিম বিশেষ।^{১৯} মার্কসের সঙ্গে শ্রী অরবিন্দ এজায়গায় ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি মন্তব্য করেন যে, সঠিক ধর্ম আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত—ইহা এই প্রমাণ করবে যে ধর্ম কোনো মতেই আফিম নয় বরং জনগণের জন্য অমৃত বিশেষ।^{২০} তিনি আরও বলেন, উচ্চরের প্রতি ভালবাসা ও বিশ্বাসকে যখন একজন অন্য একজনের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেয়, তখন স্বার্থদৰ্দু, অহংকার, নেকড়ের মতো একজন আর একজনকে কামড়াকামড়ি ইত্যাদির পরিবর্তে মানুষ পরম্পরারের প্রতি গভীর মমতায় যে কোনো অন্যায় বা অশুভশক্তির বিরোধিতা করতে পারে।^{২১} এভাবেই মন, জীবন ও দেহের উপর জীবাত্মার (Spirit) শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

শ্রীঅরবিন্দ মানুষ ও যৌথ মানব সমাজ বিষয়েও চিন্তাভাবনা করেন। তিনি বলেন, “ব্যক্তি স্বাধীনতা চায়, স্বত্ববের মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতা বা মুক্তি। কারণ স্বাধীনতা ব্যতীত জীবন পরিপূর্ণ নয়। কিন্তু ব্যক্তি নিরাপত্তাও চায়, সেই সঙ্গে যৌথভাবে উন্নত জীবনও। মানুষ একই সঙ্গে সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক সত্তা হওয়ায় দুটোর মধ্যে সমন্বয় ঘটানো খুব সহজ নয়। কারণ অতীতে মানুষ মানুষের সঙ্গে নেকড়ের মতো আচরণ করেছে, মানবতার চরম অপমান ঘটিয়েছে, যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হয়েছে। শাস্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়েছে অনেক মূল্য দিয়ে।”^{২২}

তাই শ্রীঅরবিন্দ সাম্যবাদী তত্ত্বের স্বত্ত্বাব্য প্রয়োগের বিষয়েও ভেবেছিলেন, যেখানে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যক্তির অভাব পূরণ ও সমন্বিত স্বত্ত্বার পূর্ণ মিলের কথা বলা হয়েছে। তাঁর মন্তব্য হল, “অহংবোধের মৃত্যু ও আত্মার ভাতৃত্ব বন্ধনের মাধ্যমে অবশ্যই এটি হতে পারে। জোড় করে সংঘবন্ধ করলে যান্ত্রিক ভাতৃত্ববোধ তৈরি করলে এক সময় বিশ্বব্যাপী চরম ব্যর্থতার মাধ্যমে তা শেষ হবে।”^{২৩}

আমরা মানি বা না মানি শ্রীঅরবিন্দের এই ভবিষ্যতবাণী সমকালীন অনেক ঘটনার সঙ্গে মিলে গেছে। তাঁর মতে, ইসলাম, খ্রিস্টধর্ম ও পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের স্বপ্নের আলোকে প্রতিষ্ঠিত স্বর্গরাজ্যেই স্থায়ীভাবে ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সমতা ও ভাতৃত্ববোধকে উপলক্ষ করা হলেই ভবিষ্যতের দিব্যসমাজ সত্যিকার অথেই সাম্যবাদী সমাজ হবে।^{২৪} শ্রী অরবিন্দ তাঁর The Human Cycle^{২৫} এ নতুন একটি বিশ্বতত্ত্বের (world order) স্বপ্নও দেখেছিলেন যেখানে স্বাধীনতা, সমতা ও ভাতৃত্ববোধের মতো ঈশ্বর প্রদত্ত গুণাবলী থাকবে।^{২৬} সেই বিশ্বতত্ত্বে এক অতুলনীয় নতুন জীবাত্মা মানব

জাতির হাল ধরবে।

বস্তুত ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ব্যক্তিসত্ত্বার মুক্তি বিকাশের প্রতি সম্মান—প্রয়োজন, সংহতি, স্বাভাবিক বিকাশ, সমষ্টিৎ সত্তা ও সমাজের আঙ্গিক পূর্ণতা অনুযায়ী আদর্শ সমাজ বা রাষ্ট্রগঠনই ছিল শ্রীঅরবিন্দের মূল লক্ষ্য। তাঁর চিন্তা চেতনায় আন্ত ধর্মীয় সহনশীলতা, অসাম্প্রদায়িকতা, স্বাজাত্যবোধ, জাতিগঠনের জন্য আত্মাত্যাগের আদর্শ অনুসরণ, জনগণের জন্য মুক্তিবিকাশ পদ্ধতির শিক্ষা এবং সর্বোপরি সমাজ প্রতিষ্ঠা ও কার্যাবলীতে রূপান্তরের মাধ্যমে দিব্যজীবন নির্ভর শোষণমুক্ত এক বিশ্বসমাজ গঠনের স্বপ্ন বর্তমান যুগে তাঁর চিন্তাধারাকে বিশ্ব্যাপী বৌদ্ধিক সমাজের নিকট আরও পরিচিত করে তুলেছে। এখানেই শ্রীঅরবিন্দের সার্থকতা।

পাদটীকা

১ দেখুন, en.wikipedia.org/wiki/Sri_Aurobindo

২ দেখুন, নীরদবরণ সর্বকালের সার্বজনীন শ্রীঅরবিন্দ (কলিকাতা : ডি. এন. পাবলিকেশনস, ১৯৯৩।) পৃ. ২৩-১৩৩।

৩ ঐ, পৃ. ৩৯-৪১।

৪ ‘ইন্দুপ্রকাশ’ তৎকালে বোম্বাই থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকা। এর সম্পাদক ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের কেম্ব্ৰিজের বন্ধু দেশগাণে। এই পত্রিকায় “New Lamps for Old” শীর্ষক তাঁর নয়টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। কোনো প্রবেহেই শ্রীঅরবিন্দের স্বাক্ষর থাকত না, কারণ বরোদা রাজ্য সরকারে কার্যরত থাকার কারণে তাঁর কোনো মন্তব্যের জন্য সাইয়াজিরাও গাইকোয়াড় যেন বিৱৰণ বোধ না করেন এই ছিল উদ্দেশ্য। এসব প্রবন্ধ তাঁর একুশ বছর বয়সের লিখা।

৫ “Our actual enemy is not any force exterior to ourselves, but our own crying weakness, our cowardice, our selfishness, our hypocrisy, our purblind sentimentalism.”

... “New Lamps for Old-II”. *Bande Mataram, The Complete Works of Sri Aurobindo*, vol.6-7 (Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram, 1997), p. 18.

৬ ড্র. অরঞ্জনী রায়, “আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবোধ ও শ্রীঅরবিন্দ” শ্রীঅরবিন্দায়ন, ২৫ সংখ্যা, ২০০৪, পৃ. ৮৯-৯৫; ১৯০৪ সালে শ্রী অরবিন্দ যোগাভ্যাস শুরু করেন। প্রথম যোগের প্রতি তাঁর বিশেষ কোন আকর্ষণ ছিল না। বরোদায় তাঁর বন্ধুরা যখন যোগাভ্যাস করতে বলেছিলেন তাঁদের কথায় প্রথমদিকে বিশেষ আমল দেননি। তাঁর ধারণা ছিল যোগ হচ্ছে জীবন থেকে পলায়ন। পাহাড় পর্বতে সন্ধ্যাসীর জীবন যাপন ইত্তাদি এর অনুষঙ্গ। শ্রী অরবিন্দের উদ্দেশ্য ছিল দেশমুক্তকার মুক্তি বা দেশের স্বাধীনতা, কিন্তু একযোগী নাগা সন্ধ্যাসীর মন্ত্রদেয়া পানির মাধ্যমে তাঁর ছেটভাই বারীনের জ্বর ভাল হয়ে গেলে তাঁর ভুল ভাঙ্গে। ক্রমেই যোগের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। তিনি প্রার্থনা করতেন, “হে ঈশ্বর যদি তুমি সত্ত্বিই থাক তুমি জান যে আমার নিজের মুক্তির কথা আমি ভাবি না। অন্যেরা যা চায় তার প্রতি আমার কোন মোহ নেই। আমাকে শক্তি দাও যাতে আমি দেশ ও দেশবাসীর সেবা করতে পারি।” তিনি ভাবতেন “যে যোগে আমাকে সংসার, পার্থিব জগত ত্যাগ করতে হবে, সে যোগ আমার জন্য নয়। আমাকে দেশ স্বাধীন করতে হবে। যখন জানলাম, যে তপস্যা দ্বারা মানুষ সংসার ত্যাগ করতে চায় তাকে কর্মে নিয়োজিত করাও সম্ভব, তখন যোগের শক্তিকে দেশ

মাত্রকার মুক্তির জন্য কেন না প্রয়োগ করি? দেশ সর্বপ্রথম, মানবতা তৎপরে, অন্যবিষয় নাস্তি। কোন একটা বাহিরের চাপে মন এই ভাবকে গ্রহণ করেছিল। আমার আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশ তাই পেছনের দরজা দিয়ে।” নীরদবরণের মতে, শ্রীঅরবিন্দের যোগাভ্যাস ও রাজনীতির মধ্যে কোন সংঘাত ছিল না, মিলেমিশে যেন এক হয়ে গিয়েছিল।

-- নীরদবরণ, পৃ. ৫১-৫২।

৭ ঐ, পৃ. ১৩২।

৮ ঐ, পৃ. ৭০।

৯ “The yoga we practice is not for ourselves, but for the divine;...Its object is not personal
Mukti,...but the liberation and transformation of the human being.”

-- Sri Aurobindo, *Supramental Manifestation & Other Writings* (Twin Lakes, WI: lotus Light Publication, 1997), p. 507.

১০ Sri Aurobindo, “The Doctrine of Sacrifice”. *Karmayogin: Political Writings and Speeches, 1909. 1910, The Complete Works of Sri Aurobindo*, vol. 8 (Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram, 1997), p. 62.

১১ ঐ, p. 137.

১২ তথ্য।

১৩ মাত্রমন্ত্রে ভারতশক্তিকে আহ্বান করে বিশ্ববী প্রচার ও তৎকালীন ভারতের স্বাধীনতার জন্য উদ্বোধনা সৃষ্টিকল্পে মন্দির স্থাপনই এই পুস্তিকার উদ্দেশ্য। মূলত বিশ্ববী বারীনের অনুপ্রেরণা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি এটি রচনা করেন। শ্রীঅরবিন্দের মতে, মাতবানী হলেন অসীম ও মহাশক্তিদ্বায়ীনি সম্মিলিত দেবতাপুঁজের শক্তির সমন্বয়ে সৃষ্ট যা ত্রিশ কোটি জনতার সম্মিলিত শক্তির ধারক। এই পুস্তিকটি সেসময় হাজার হাজার বিশ্ববীদের হাতের সাহস ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল।

-- নীরদবরণ, সর্বকালের সার্বজনীন শ্রীঅরবিন্দ, পৃ. ৫৩-৫৪।

১৪ দেখুন, Sri Aurobindo, ‘Bhawani Mandir’, *Bande Mataram: Political Writings and Speeches 1890-1908*, pp. 75-90; *The Complete works of Sri Aurobindo*, vol. 6-7 (Pondicherry Sri Aurobindo Ashram Publication Department, 2002)

১৫ নীরদবরণ, পৃ. ৭৭।

১৬ ঐ, পৃ. ৭৮, ২৫৭; দেখুন, Sri Aurobindo, *On education*. (Pondicherry; Sri Aurobindo Ashram, reprint 1990).

১৭ ‘আর্য’ মূলত একটি দার্শনিক সাময়িকপত্র। ১৯১৪ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত প্রকাশিত এই সাময়িকপত্রটি যৌথভাবে প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন শ্রীঅরবিন্দ, পল রিসার ও মিরা আলফাসা। এতে শ্রীঅরবিন্দের গুরুত্বপূর্ণ রচনাগুলির অধিকাংশই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এগুলি হচ্ছে: ‘দি লাইফ ডিভাইন’, দি সিস্টেসিস অব ইয়োগা, দি সিক্রেট অব দি বেদ, দি ফাউন্ডেশন অব ইন্ডিয়ান কালচার, দি ফিউচার পোয়েট্রি, দি হিউম্যান সাইকেল এবং ডি আইডিয়াল অব হিউম্যান ইউনিটি।

১৮ এই প্রাচৃতি শ্রীঅরবিন্দের দর্শনবিষয়ক মুখ্য রচনা। এই প্রাচৃতি তিনি এক আধ্যাত্মিক বিবর্তনবাদের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যার ফলে মনোময় মানুষ পর্যায়ক্রমে অতিমানবিক সত্ত্ব রূপান্তরের মধ্য দিয়ে এই পার্থিব জীবনেরই এক দিব্যজীবনে উন্নীর হতে পারবে।

১৯ *Synthesis of Yaga* শ্রীঅরবিন্দের যোগ বিষয়ে মুখ্য রচনা। প্রাচীন যোগপদ্ধতিগুলির

- সুনিপুণ বিচার বিশ্লেষণসহ তাদের আস্তর সত্ত্বের সমন্বয় বিধান এবং শ্রীঅরবিন্দ প্রদর্শিত পূর্ণযোগের এবং অতিমানসিক যোগের বর্ণনা।
- ২০ সাবিত্রী ইংরেজি ভাষায় রচিত মহাকাব্যধর্মী রচনা। এটি মোট বার অধ্যায়ে বিভক্ত, প্রত্যেকটি অধ্যায় আবার বিভিন্ন চরণে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যে বিভক্ত। শ্রীঅরবিন্দ সাবিত্রী'কে a legend and a symbol হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। মহাভারতে সাবিত্রী সত্যবান আখ্যায়িকার মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এখানকার কাহিনি হল মানব জীবনের আখ্যায়িকা এবং বৈদিক সূত্রের বহু প্রতীকি পুরাণ কাহিনির অন্যতম আখ্যান।
- ২১ এন. এইচ. এম. আবু বকর, “শ্রীঅরবিন্দের সাধন-পদ্ধতির স্বরূপ”, শ্রীঅরবিন্দায়ন, খণ্ড ২৩, চট্টগ্রাম, পৃ. ১১৯-১২০; নীরদবরণ, পৃ. ২১৭; দ্র. Sri Aurobindo, *Life Divine*, Book I, Chapter I & II. (Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram, 5th ed., 1997)
- ২২ আবু বকর, ঐ, পৃ. ১২১।
- ২৩ ঐ, পৃ. ১২২; শব্দ ; বাংলা পুস্তকের তালিকা (পঞ্চিচৰী ; শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, জানুয়ারী ১৯৯৮), পৃ. ৩।
- ২৪ Amalendu De, *Relevance of Sri Aurobindo's Thought in Modern Times* (Calcutta: Sri Aurobindo Samiti, not date), pp. 8-9.
- ২৫ তথ্য।
- ২৬ ‘The religion which embraces Science and faith, Theism, Christianity, Mahomedanism and Buddhism and yet is none of these, is that to which the world spirit moves.’
-- Sri Aurobindo, ‘The Ideal of Karmayogin’, *Karmayogin: Political Writings and Speeches, 1909-1910, The Complete Works of Sri Aurobindo* vol. 8 (Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram, 1997), p. 26
- ২৭ Sri Aurobindo, “The Rights of Association”, *Karmayogin*, p. 70.
- ২৮ Karl Marx, “Introduction”, *A Critique of Hegel's Philosophy of Right*, trans. Annette Jolin and Joseph O’ Malley (Cambridge: University Press, reprint 1970)
- ২৯ Amalendu De, p. 10
- ৩০ ঐ, p. 10
- ৩১ ঐ, pp. 10-11.
- ৩২ Manoj Das, “Explorer of consciousness”. *Life Positive* (New Delhi), August 1997.
- ৩৩ Sri Bhattacharjee, “A Fragrant flower of Cambridge (Sri Aurobindo – His Contribution to Humanity)”, Booklet 2, Sri Aurobindo Society, UK, 2nd ed., January 1993.
- ৩৪ এই গ্রন্থে মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ ও বিবর্তনমূলক লক্ষ্যের দিক থেকে মানবসমাজের বিকাশের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।
- ৩৫ Sri Aurobindo, “The Religion of Humanity,” *The Ideal of Human Unity, The Complete Works of Sri Aurobindo*, vol. 15 (Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram, 1997). p. 570.

অস্তিত্বহীনতা থেকে আন্দোলনের পথে : বাংলার উদ্বাস্তু জীবনের কয়েকটি টুকরো ছবি অনিদিতা ঘোষাল

‘দেশভাগ’ শব্দটির অর্থ ব্যাপক, আবার এই ব্যাপকতার চেয়েও বেশি সুদূর প্রসারী। কারণ এই শব্দটিকে রাজনৈতিক বা আঞ্চলিক বিভাজনের মোড়কে মূলত ব্যবহার করলেও আসলে এটি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মের ক্ষেত্রে এক শক্তির সময়কালকেই তুলে ধরে। তাই বলা যায়, দেশভাগ এমনই এক হাদয় বিদ্বারক ঘটনা যা সভ্যতার সূচনার সময়কাল থেকেই বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষকে এর ব্যাপকতা ও পরিণতির সংস্পর্শে আসতে বাধ্য করেছে। ১৯৪৭ সালে যে ভারত বিভাগ হয়, তাতে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি নতুন ভৌগোলিক সীমানা নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের জন্ম হয়। কিন্তু এই তথাকথিত দেশভাগ যদিও মোটামুটি সবক্ষেত্রে ছিল রাজনৈতিক বা আঞ্চলিক বিভাগের সমার্থক; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল সদ্যভূমিষ্ঠ দুটি শিশু রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীক জীবনের সবচেয়ে বেশি টানাপোড়েনের সময়কালের ছবি। একথাও এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে এই প্রেক্ষাপটে সাধারণ মানুষের জীবনের গতিপথ সবচেয়ে বেশি পরিবর্তিত হয়েছিল।

সেই সময়কার গোটা বাংলার ইতিহাসকে ফিরে দেখলে মনে হয় যে, বিভিন্ন টালবাহানা ও ঘটনার পর্যায়ক্রমে ১৯৪০-এর দশক থেকেই অবিভক্ত বাংলায় দেশভাগের বার্তা পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিত এলিট শ্রেণির মধ্যে পৌছে গিয়েছিল। যে কারণে ১৯৪৫ সালের মাঝামাঝি সময় কাল থেকে অবস্থাপন্ন হিন্দুরা ক্রমশঃ পশ্চিমবাংলার দিকে অভিপ্রায়ান করতে শুরু করে। তৎকালীন ও পরবর্তী ঐতিহাসিকার বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে এই বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন যে—মূলতঃ হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লিঙের সাম্প্রদায়িকতাই এই পরিস্থিতিকে সৃষ্টি করতে বাধ্য করেছিল। অধ্যাপক সুরঞ্জন দাস-এর মতে পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু সমস্যা যে অন্যতম ‘সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যা’ হিসেবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, তার মূল শিকড় নিহিত ছিল সাম্প্রদায়িক সমস্যার মধ্যে।^১ ১৯৪০-এর দশকের পরবর্তীতে পরিস্থিতিতে তা এক অত্যন্ত নেতৃত্বাচক কিন্তু অনিবার্য ভবিতব্য হয়ে ওঠে স্বাধীনতা পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে।